ইউনিট-৩

নৈতিক চেতনা ও সভ্যতা
Ethical Awareness and Civilization

ভূমিকা

নৈতিক চেতনা একটি মানসিক ক্রিয়া। মানুষ যখন তার ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর ন্যায়-অন্যায় বোধ, উচিত-অনুচিত বোধ সম্পর্কে সচেতন হয় তখন ধরে নিতে হবে মানুষ নৈতিক চেতনার পরিসরে তার ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীকে বিবেচনা করছে। নৈতিক চেতনা মানুষকে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে যা মূলত চিন্তাপ্রসূত, সামাজিক, সক্রিয়, বাধ্যবাধকতামূলক, ভাবাবেগমূলক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ।

নৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ যখন একটি পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় তখন তাকে বলা হয় নৈতিক আদর্শ। আবার জীবনের পূর্ণতা অর্জনের জন্যে মানুষ যখন পরম লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় তখন তাকে বলা হয় নৈতিক প্রগতি ।

মানুষ নৈতিক আদর্শের বলে বলীয়ান হয়ে যখন নৈতিক প্রগতির দিকে ধাবিত হয় তখন তার কতকগুলো সদগুণ থাকতে হয় যেগুলো মানুষের নৈতিক অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধনে যুগবদ্ধ থাকে। এ ইউনিটে আমরা নৈতিক চেতনা, নৈতিক প্রগতি, সততা, নৈতিক অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ।

এছাড়াও এ ইউনিটের আরেকটি প্রত্যয় হলো সভ্যতা। ভৌগলিক তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের আশির্বাদপুষ্ট ফসল হলো সভ্যতা। যাযাবরেরা কৃষিজীবীদের পরাস্ত করে রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের পত্তন করে। সভ্যতার উদ্ভবের জন্যে বিভিন্ন উপাদান দায়ী হলেও প্রধানত দায়ী হলো 'অভাব', 'প্রয়োজন' ও 'তাগিদ'।

'নৈতিক চেতনা ও সভ্যতা' শীর্ষক ইউনিটের আলোচনা নিম্নরূপ ৫টি পার্বে বিন্যস্ত হবেঃ

- *পাঠ-১. নৈতিক চেতনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য*
- *পাঠ-২. সততার তাৎপর্য : ব্যক্তিগত ও সামাজিক সততা*
- *পাঠ-৩. নৈতিক প্রগতি ও এর শতার্বালী*
- *পাঠ-৪. মানুষের নৈতিক অধিকার ও কর্তব্যের স্বরূপ*
- *পাঠ-৫. সভ্যতা*

নৈতিক চেতনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ-১

The Nature of ethos and its Features

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ◆ নৈতিক চেতনা কাকে বলে বলতে পারবেন
- ◆ নৈতিক চেতনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ◆ নৈতিক চেতনার উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

নৈতিক চেতনা

অনৈতিক চেতনা নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নৈতিক চেতনা মানুষকে তার আচরণের নৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। মানুষকে তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কীয় নৈতিক চেতনা কেবল মানুষকে তার নিজস্ব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতেই সাহায্য করে না, বরং অপরাপর মানুষের সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে থাকে।

নৈতিক চেতনা মানুষকে তার আচরণের নৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

নৈতিক চেতনা এমন এক বিশেষ ধরনের মানসিক ক্রিয়া যা আমাদেরকে আমাদের ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলী ন্যায়-অন্যায় বা উচিত-অনুচিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। নৈতিক চেতনা আমাদের বলে দেয়, আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত নয়, দুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করা ভাল এবং কাউকে আঘাত করা মন্দ। নৈতিক চেতনা আমাদেরকে আমাদের কার্যাবলীর ন্যায়বোধ ও অন্যায়বোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। আমাদের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের নৈতিকতা সম্পর্কীয় এ চেতনা ন্যায় কাজ সম্পন্ন করার ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার জন্যে আমাদের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

নৈতিক চেতনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

আমাদের ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর গুণ বা আমাদের চরিত্রের নৈতিক গুরুত্বের অবগতি হচ্ছে নৈতিক চেতনা। নৈতিক চেতনার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং নীচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. নৈতিক চেতনা চিন্তামূলক : নৈতিক চেতনা আমাদের ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর নৈতিক গুণ সম্পর্কীয় চেতনা। ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলী বিবেচনা, পছন্দ ও সংকল্পের সঙ্গে জড়িত বলে তা আমাদের মনের চিন্ড়মূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটায়। ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর উচিত ও অনুচিত বোধ নৈতিক আদর্শের প্রেক্ষিতে নিরুপণ করা হয়। যে কাজ নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাকে ন্যায় এবং যে কাজ নৈতিক আদর্শের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ তাকে অন্যায় কাজ বলা হয়। তাই আমাদের ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর ন্যায় ও অন্যায় বোধ সম্পর্কীয় নৈতিক চেতনা আমাদের চিন্তামূলক দুষ্টিভঙ্গীর ফল।

খ. নৈতিক চেতনা সক্রিয় : নৈতিক চেতনা আমাদের ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর ন্যায় ও অন্যায বোধ সম্পর্কীয় সচেতনতাকে বুঝায়। নৈতিক চেতনা মানুষের নিষ্ক্রিয় অভিজ্ঞতার পরিবর্তে ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর উল্লেখ করে। ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মানুষের বিবেচনা, পছন্দ ইত্যাদি জড়িত বলে বিকল্প কার্যাবলীর মধ্যে ন্যায় কাজকে গ্রহণ করতে ও অন্যায় কাজকে বাদ দিতে নৈতিক সক্রিয়তা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর নৈতিক মূল্যায়ন সম্পর্কীয় সচেতনতা হচ্ছে নৈতিক চেতনা। তাই নৈতিক চেতনা সক্রিয়।

নৈতিক চেতনা আমাদের ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর নৈতিক গুণ সম্পর্কীয় চেতনা।

গ. নৈতিক চেতনা সামাজিক : মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের নৈতিক জীবনে সামাজিক পটভূমির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। নৈতিক চেতনার মাধ্যমে মানুষের ভাল-মন্দের ধারণা সমাজের অপরাপর ব্যক্তির ভাল-মন্দের প্রশ্নকেও জড়িত করে থাকে। সমাজের অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা স্মরণ রেখেই মানুষের নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ব বা ভাল-মন্দের বিচার করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, নৈতিক চেতনা সামাজিক।

ঘ. নৈতিক চেতনামূলক : নৈতিক চেতনার ফলে আমরা ভাল কাজ করার জন্যে এবং মন্দ কাজ বাদ দেয়ার জন্যে একটা নৈতিক বাধ্যতাবোধ অনুভব করি বলে নৈতিক চেতনার সঙ্গে নৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়। এই নৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধ কোন বাইরের

কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আসে না। এটা আমাদের অন্তরের ভেতর থেকে আসে । তাই, এটা স্ব-আরোপিত। অতএব বলা যায়, নৈতিক চেতনা বাধ্যবাধকতামূলক।

ঙ. নৈতিক চেতনা ভাবাবেগমূলক : নৈতিক আদর্শের জন্যে নৈতিক চেতনার একটা শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। ভাল কাজের ক্ষেত্রে যেমন আমাদের মনে একটা প্রীতিকর ভাব জেগে উঠে, তেমনি মন্দ কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের মনে একটা অপ্রীতিকর ভাব জেগে উঠে। তাই নৈতিক চেতনার মধ্যে একটা ভাবাবেগমূলক অবস্থা বিরাজ করে । এটা নেহায়েতই মানুষের অন্ড়রের অনুভূতির ব্যাপার ।

নৈতিক চেতনার উপাদান

আমরা আগেই জেনেছি যে, ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলী উচিত-অনুচিত বোধ, ভাল-মন্দ সম্পর্কিত চেতনাকে বলা হয় নৈতিক চেতনা। নৈতিক চেতনা একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া। এতে চিন্তামূলক, অনুভূতিমূলক ও ইচ্ছামূলক উপাদান বর্তমান। নিচে নৈতিক চেতনার উপাদান সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হলো :

(ক) **চিন্তামূলক উপাদান :** নৈতিক পার্থক্যবোধ ও এ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নৈতিক চেতনার চিন্তামূলক উপাদান । নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নৈতিক পার্থক্যবোধের অন্তর্গত :

১. ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ সম্পর্কিত নৈতিক বিচার। এটি আচরণের উচিত-অনুচিতের বোধকে নির্দেশ করে । যথাযথ কাজ কোনটি তা বুঝতে অনুচিত কাজ কোনটি তা বুঝা দরকার।
২. আত্মসচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রণশীল সত্তা । মানুষ যে ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলী ও অভ্যাসজাত কার্যাবলী সম্পাদন করে তা করার জন্যে তার নৈতিক বিচারে আত্মসচেতনতা থাকতে হবে ।
৩. কোন একটি আদর্শের চেতনা যে আদর্শ ন্যায়-অন্যায় ভালমন্দের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাপন করে।
৪. কল্যাণের ধারণা নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে সুষ্ঠু মতবাদ গঠনে সাহায্য করে ।
৫. নৈতিক বিচার যথোচিত ও অনুচিত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যবোধের নির্দেশ দেয়।
৬. উচিত ও অনুচিত ধারণা আমাদের মনে কর্তব্যবোধ সৃষ্টি করে । যে কাজকে আমরা উচিত বলে মনে করি সে কাজ সম্পাদন করার একটা তাগিদ অনুভব করি, আবার যে কাজকে আমরা অনুচিত বলে মনে করি সে কাজ সম্পাদন করার তাগিদ অনুভব করি না।
৭. কর্তব্যবোধের সাথে অধিকারের প্রশ্নও জড়িত । একজনের যা কর্তব্য অন্যের তা অধিকার।
৮. উৎকর্ষ ও অপকর্ষের চেতনা এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য। কারণ যে ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ তাকে আমরা প্রশংসা করি ; আর যে ব্যক্তি কর্তব্য কাজে কর্তব্যপরায়ণ নয় তাকে আমরা নিন্দা করি।
৯. দায়িত্ববোধের চেতনাও বিবেচ্য। বিচারশক্তিসম্পন্ন মানুষ তার ইচ্ছাকৃত ও অভ্যাসপ্রসূত কাজের জন্যে দায়ী।
১০. ধর্ম ও অধর্মের চেতনা এ ক্ষেত্রে অন্যতম মানদন্ড বলে মনে করা যায়।

(খ) **আবেগমূলক উপাদান :** নৈতিক ভাবাবেগ হচ্ছে নৈতিক চেতনার আবেগমূলক উপাদান। যখন আমরা কোন কাজকে ন্যায় বলে মনে করি, তখন আমাদের মনে একটা প্রীতিভাব জেগে উঠে এবং সেই কাজটি আমাদের অনুমোদন লাভ করে থাকে। আবার যখন আমরা কোন কাজকে অন্যায় বলে মনে করি, তখন আমাদের মনে একটা অপ্রীতিকর ভাব জেগে উঠে এবং সেই কাজটিকে আমরা অনুমোদন দেই না। তাই দেখা যায়, ন্যায় কাজের ক্ষেত্রে সন্তোষের ভাব ও অন্যায় কাজের ক্ষেত্রে অসন্তোষের ভাবের সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, নৈতিক অবধারণের ক্ষেত্রে সন্তোষ-অসন্তোষের মতো নৈতিক ভাবাবেগ বর্তমান থাকে।

(গ) **ইচ্ছামূলক উপাদান :** তাড়না সংকল্প হচ্ছে নৈতিক চেতনার ইচ্ছামূলক উপাদান।নৈতিক অবধারণের ক্ষেত্রে আমাদের একটা কর্মপন্থাকে নির্বাচন করতে হয় এবং নৈতিক বিচার আমাদের মনে একটি বাধ্যবাধকতাবোধ সৃষ্টি করে।যে কাজটি ন্যায় বলে মনে হয় সে কাজটি করতে আমাদের মনে একটা তাড়নার সৃষ্টি হয় এবং যে কাজটি অন্যায় বলে মনে হয় সে কাজ থেকে বিরত থাকতে আমাদের মনে একটা তাড়নার সৃষ্টি হয়; আর এই তাড়নাকেই ক্রিয়ামূলক আবেগ বলা যেতে পারে ।

সারকথাঃ
নৈতিক চেতনা একটি মানসিক ক্রিয়া। মানুষ যখন তার ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর ন্যায়-অন্যায় বোধ, উচিত অনুচিত বোধ সম্পর্কে সচেতন হয় তখন ধরে নিতে হবে মানুষ নৈতিক চেতনার পরিসরে তার ইচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীকে বিবেচনা করছে। নৈতিক চেতনা মানুষকে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যকার পার্থক্য বুঝাতে সহায়তা করে যা মূলত চিন্তাপ্রসূত, সামাজিক, সক্রিয় এবং অনেকাংশে বাধ্যবাধকতামূলক, ভাবাবেগমূলক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. নৈতিক চেতনা কোন ধরনের ক্রিয়া ?
- ক. সামাজিক
- খ. সাংস্কৃতিক
- গ. মানসিক
- ঘ. অর্থনৈতিক।

২. নিচের কোনটি আমাদেরকে আমাদের কার্যাবলীর ন্যায় ও অন্যায় বোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে ?
- ক. নৈতিক প্রগতি
- খ. নৈতিক চেতনা
- গ. নৈতিক আদর্শ
- ঘ. নৈতিক ভাবাবেগ।

৩. নৈতিক চেতনার আবেগমূলক উপাদান কি?
- ক. নৈতিক ভাবাবেগ
- খ. তাড়না
- গ. উচিত অনুচিত বোধ
- ঘ. উৎকর্ষ ও অপকর্ষের চেতনা।

৪. নৈতিক চেতনার ইচ্ছামূলক উপাদান কি?
- ক. নৈতিক প্রগতি
- খ. নৈতিক চেতনা
- গ. নৈতিক আদর্শ
- ঘ. নৈতিক ভাবাবেগ।

উত্তর : ১. গ ২. খ, ৩. ক, ৪. গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নৈতিক চেতনা কাকে বলে ?
২. নৈতিক চেতনার প্রকৃতি কি রূপ ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. নৈতিক চেতনার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন ।
২. নৈতিক চেতনার উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন ।

পাঠ- ২

সততার তাৎপর্য : ব্যক্তিগত ও সামাজিক সততা

Significance of Honesty : Personal and Social Honesty

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সততার স্বরূপ বলতে পারবেন।
- সততা সম্পর্কে সক্রেটিস ও এ্যারিষ্টটলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সততার শ্রেণীবিন্যাস আলোচনা করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত ও মৌলিক সততা কাকে বলে বর্ণনা করতে পারবেন।

সততার স্বরূপ

ইংরাজি Virtue শব্দটির অর্থ মানবীয় গুণ। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে এ শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে সততা বলতে বুঝায় মানুষের চরিত্রের স্থায়ী প্রবণতা। সততা মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা নয়, অর্জিত প্রবণতা। কর্তব্য করার অভ্যাসের ফলেই সততা জন্মে। সততার স্বরূপ সম্পর্কে এরিষ্টটল বলেন, সততা মনের স্থায়ী অবস্থা যা ইচ্ছার দ্বারা গঠিত এবং যার ভিত্তি বাস্তব জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ-যে আদর্শটি বিচারবুদ্ধি স্থির করে দিয়েছে। তাই দেখা যায় নৈতিক আদর্শ অনুসারে ভাল কাজ নির্বাচন ও সম্পাদনের মাধ্যমেই যে অভ্যাস গড়ে উঠে তাই সততা। কোন মানুষ জন্মগতভাবে সৎ হতে পারে না, মানুষ ভাল কাজ করতে যখন সৎ অভ্যাস গঠন করে, তখন তাকে সৎলোক বলা হয়। সুচরিত্রের অধিকারী হলেই মানুষকে সৎ বলা যায়। মানুষ যখন তার প্রবৃত্তি, কামনা ও বাসনাকে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে জীবনযাপন করে তখন সে চরিত্রবান বলে বিবেচিত হয়। তাই ম্যাকেনজী বলেন, সততা বলতে বুঝায় চরিত্রের সৎ অভ্যাস এবং তা কর্তব্য থেকে পৃথক। কর্তব্য বলতে বুঝায় এক বিশেষ ধরনের কাজ যা আমাদের করা উচিত।

সততা সম্পর্কে সক্রেটিস ও এ্যারিষ্টটলের ধারণা

সক্রেটিসের মতে সততা হল জ্ঞান। যে ব্যক্তি কল্যাণের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে সে সৎ কাজ না করে পারে না। আবার যে ব্যক্তি কল্যাণের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, সে সৎকাজ করতে পারে না। কাজেই জ্ঞানমানে সততা এবং অজ্ঞানতাই অসদাচার। সক্রেটিস মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অন্যায় কাজ করতে পারে না। তাই জ্ঞানই সততার মূলকথা।

সক্রেটিসের মতবাদ সমর্থন করলে মানুষকে তার অন্যান্য কার্যের জন্যে দায়ী করা চলে না। জ্ঞান যদি সততা হয় এবং অজ্ঞানতা যদি অসদাচার হয়, তবে মানুষ তার গর্হিত কার্যের জন্যে দায়ী নয়, কেননা এটি তার জ্ঞানপ্রসুত। কাজেই সক্রেটিসের মতবাদ এ প্রসঙ্গে কতটুকু গ্রহণ করা যায় তা ভেবে দেখার বিষয়।

দ্বিতীয়ত, সক্রেটিসের মতের যতটুকু বাস্তব ভিত্তি আছে তাও প্রশ্নবোধক। মানুষ অনেক সময় অন্যায়কে অন্যায় জেনেও অন্যায় করে। মানুষ কোন কাজকে ন্যায় কাজ মনে করলেই যে তা করতে বাধ্য থাকবে এমন নয়। কেননা অনেক সময় মানুষকে তার বিচার বা সিদ্ধান্তের বিপরীত কাজ করতে দেখা যায়। কাজেই জ্ঞাতসারে মানুষ অন্যায় কাজ করে না, এটি সত্য নয়। সততা শুধু জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, জ্ঞান এবং অভ্যাস উভয়ই সততার জন্যে অপরিহার্য।

এ্যারিষ্টটলের মতে সততা হল মধ্যপন্থা নির্বাচন করার অভ্যাস, যে মধ্যপন্থা নিয়ন্ত্রিত বিচারবুদ্ধি ও ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা নির্ধারিত। মানুষের শক্তি ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার মধ্যে নিহিত রয়েছে সততার ভিত্তি। সততা এক ধরণের পরিমিতিবোধ, দুটি অসদাচারের মধ্যবর্তিকা-একদিকে আতিশয্য এবং অন্যদিকে অভাব কিংবা অনুভূতি ও ইচ্ছার অভাব এবং আতিশয্যের মধ্যবর্তিকা। কাজেই, সততা একটি পরিমিত বা মধ্যবর্তী অবস্থা। কোন কিছুর আতিশয্য বা অভাব/উভয়কে এ্যারিষ্টটল অসদাচার মনে করতেন। অনেক ধরণের সততা দু'টি চরম অবস্থার মধ্যবর্তী। যেমন-সাহসিকতা একটি সততা, একদিকে হঠকারিতা এবং অন্যদিকে কাপুরুষতার মধ্যবর্তী

অবস্থা। অনুরূপভাবে, উদারতা একটি সততা, যা অপব্যয় ও কার্পণ্যের মধ্যবর্তী অবস্থা। অবশ্য বিভিন্ন ব্যক্তির জন্যে এই মধ্যপন্থা বিভিন্নরকম হতে পারে।

এরিষ্টটলের মতবাদের মধ্যে বেশ কিছুটা সত্য আছে। নৈতিক নিয়ম অনুসারে প্রবৃত্তিক বিচারবুদ্ধির মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনই সততা; অর্থাৎ মানব জীবনে প্রবৃত্তি ও বিচারবুদ্ধি উভয়ের পরিমিত অবদান অপরিহার্য। এ পর্যন্ত এ্যারিষ্টটলের মতবাদ যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রয়োগ করা কঠিন ব্যাপার। যখন কোন দেশ বহি:শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয, তখন শত্রুকে ধ্বংস করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠে। দেশপ্রেম- এ সততার মধ্যে আতিশয্য আছে। তাঁর মত সমর্থন করলে দেশপ্রেমকে সততা বলা কঠিন। পরম কল্যাণের ধারণা ছাড়া সততাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সকল অবস্থায় পরিমিত অপরিমিতির মতই অসদাচার, কাজেই সকল ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বনকে সততা বলা যায় না।

সততার শ্রেণীবিন্যাস

সততা ও সদগুণাবলী অসংখ্য। এদের সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন নীতি শাস্ত্রবিদ বিভিন্নভাবে সদগুণাবলী বা সততার শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। অনেকেই সততাকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা-(ক) আত্মকেন্দ্রিক সততা (খ) পরকেন্দ্রিক সততা এবং (গ) আদর্শকেন্দ্রিক সততা।

(ক) **আত্মকেন্দ্রিক সততা :** এ ধরনের সততা মূখ্যত ব্যক্তির নিজের কল্যাণ সাধনের উপযোগী। তাই বলে সততা যে শুধু ব্যক্তির কল্যাণে সীমিত থাকবে এমন নয়। কেননা যেহেতু ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেহেতু ব্যক্তির কল্যাণ সমাজ কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। আত্মকেন্দ্রিক সততার কতকগুলো উপভাগ দেয়া হবে :

(১) **সাহসিকতা :** মানুষের দু:খভীতিকে জয় করার শক্তিকে সাহসিকতা বলা হয়। ভবিষ্যতের বৃহত্তর এবং মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে বর্তমানের দু:খ-কষ্ট সহ্য করার শক্তি হল সাহসিকতা। মনোবল, ধৈর্য, অধ্যবসায়, দৈহিক সাহস ইত্যাদি এ শ্রেণীর সততার অন্তর্গত।

(২) **মিতাচার :** ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণ লাভের ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধন করাকে মিতাচার বলা হয়। মানুষ কল্যাণ লাভের জন্যে সংযত ও বিচারবুদ্ধিসন্মত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

(২) **পরিশ্রম ও অধ্যবসায় :** সাময়িক আরাম-আয়েশ তুচ্ছ করে উচ্চতর কল্যাণ লাভের জন্যে দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধন করা ব্যক্তির অবশ্য করণীয় ; পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ছাড়া জীবনের সীমাহীন সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষকে মানুষ হিসাবে বাঁচতে হলে পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের অনুশীলন আবশ্যক।

(৪) **মিতব্যয়িতা :** মিতব্যয়িতা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ বিধানের জন্যে অপরিহার্য। বাক্য, কার্য ও চিন্তায় মিতব্যয়ী হওয়া মানুষের উচিত। আর্থিক মিতব্যয়িতাই শুধু পালনীয় নয়। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দিকে মিতব্যয়িতার অভ্যাস বাঞ্ছনীয়। মিতব্যয়িতা শুধু ব্যক্তিগত কল্যাণই আনয়ন করে না, সমাজের কল্যাণও সাধন করে।

(খ) **পরকেন্দ্রিক সততা :** পরকেন্দ্রিক সদগুণাবলী অপরের কল্যাণ সাধনের জন্যে নিয়োজিত হয়। যেমন- (১) **ন্যায়পরায়ণতা :** প্রত্যেক মানুষের পরিশ্রমের যোগ্য পুরস্কার দেওয়া, কিংবা তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করা ন্যায়পরায়ণতার অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে ন্যায়পরায়ণতা বলতে সেই সকল গুণকে বুঝায়, যেগুলো সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সাথে আমাদের সম্পর্ক মধুময় করে।

(২) **বদান্যতা :** অপরের কল্যাণ সাধনের ইচ্ছাকে বদান্যতা বলা হয়। বদান্যতা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, যেমন- স্নেহ, বন্ধুত্ব, দেশপ্রেম ইত্যাদি।

(গ) **আদর্শকেন্দ্রিক সততা:** নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের জন্যে আকাঙ্ক্ষা আদর্শের সততা। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শ অনুসারে জীবনকে গড়ে তোলার বাসনা ও সে অনুসারে কাজ করার অভ্যাসকে আদর্শকেন্দ্রিক সততা বলে। আদর্শকেন্দ্রিক সততা তিন ধরনের হতে পারে। যথা- (১) বুদ্ধি সম্বন্ধীয় সততা (২) সৌন্দর্যসম্বন্ধীয় সততা এবং (৩) নৈতিক সততা।

(১) **বুদ্ধি সম্পর্কীয় সততা :** বুদ্ধি সম্পর্কীয় সততা বলতে বুঝায় আদর্শ জীবন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান লাভের অনুসন্ধিৎসা।

(২) **সৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয় সততা:** সৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয় সততা হলো যা কিছু সুন্দর তা লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে জীবনযাপনের মানসিক প্রবণতা।

(৩) **নৈতিক সততা:** নৈতিক সততা বলতে বুঝায় পরমকল্যাণ লাভের জন্যে বুদ্ধিদীপ্ত জীবনযাপনের চেষ্টা, নৈতিক আদর্শ অনুসারে জীবন গঠন করা।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক সততা

মিতাচার ও মানসিক উৎকর্ষকে ব্যক্তিগত সততা বলে অভিহিত করা হয়। মিতাচার হলো প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা। মিতাচারের না বোধক ও হাঁ বোধক দু'টি দিক রয়েছে। না বোধক দিক দিয়ে মিতাচার হলো নৈতিক নিয়মানুসারে জীবনযাপন করা; অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। হাঁ বোধক দিক দিয়ে মিতাচার জীবনের উদ্দেশ্যের ঐক্যসূত্র। আমাদের জীবনের স্বাভাবিক শক্তিকে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। কাজেই মিতাচার একটি ব্যক্তিগত সততা। মানসিক উৎকর্ষ বলতে মানুষের সকল আত্মিক শক্তির স্ফূরণ বুঝায়। আমরা যখন বুদ্ধিগত, অনুভূতিমূলক ও ইচ্ছামূলক সমস্ত শক্তির সুসংহত বিকাশ সাধন করতে সমর্থ হই তখন আমরা সত্যিকার মানসিক উৎকর্ষের অধিকারী হই। অবশ্য মানসিক উৎকর্ষ লাভের জন্যে দৈহিক উৎকর্ষের প্রয়োজন। নৈতিক উৎকর্ষ লাভের জন্যে দৈহিক সুস্থতার প্রয়োজন। একথা সত্য যে সুস্থ মানসিক অবস্থার জন্যে সুস্থ দেহের প্রয়োজন।

ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতাকে সামাজিক সততা বলে অভিহিত করা হয়। ন্যায়পরায়ণতা নাবোধক সততা এবং বদান্যতা হাঁ বোধক সততা। অন্যের ব্যক্তিগত সততা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করাই ন্যায়পরায়ণতা। ন্যায়পরায়ণতা, বদান্যতার পূর্বগামী। উদার হতে হলে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। বদান্যতা হল অন্যের ব্যক্তিগত সততা বিকাশে সাহায্য করা। সহানুভূতি, সমবেদনা ও ভালবাসা বদান্যতার অন্তর্গত। অন্যের সুখ-দু:খকে নিজের সুখ-দু:খ হিসেবে মনে করতে পারা বা অন্যের সুখ-দু:খের সঙ্গে নিজেকে একীভুত করাই বদান্যতা। বদান্যতার স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে বিশ্বপ্রেমে।

মৌলিক সততা

মৌলিক সততা বলতে সেই সদগুণাবলীকে বুঝায়, যা বিভিন্ন শ্রেণীর সদগুণাবলীর ভিত্তি। প্লেটোর মতে, মৌলিক সততা সংখ্যায় চারটি, যথা-জ্ঞান, সাহসিকতা, আত্মসংযম এবং ন্যায়পরায়ণতা। জ্ঞান ছাড়া মানুষ তার কর্তব্য স্থির করতে পারে না, জ্ঞান নৈতিক জীবনের এক অপরিহার্য শর্ত। সাহসিকতা ও আত্মসংযম আত্মকেন্দ্রিক সততা, সাহসিকতা হলো সুখের প্রলোভনকে জয় করার ইচ্ছাশক্তি। ন্যায়পরায়ণতা হলো ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তাকে পরিবর্তন করা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা। ন্যায়পরায়ণতা সকল সামাজিক সদগুণের ধারক।

সারকথা:

সততা হলো জ্ঞান। যে ব্যক্তি কল্যাণের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে সে সৎ কাজ না করে পারে না। তাই সততা মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা নয়, অর্জিত প্রবণতা। মানুষের শক্তি ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার মধ্যে নিহিত রয়েছে সততার ভিত্তি। তাই সততা এক ধরনের পরিমিতি, দু'টি অসদাচারের মধ্যবর্তিকা। একদিকে আতিশয্য এবং অন্যদিকে অভাব। নৈতিক নিয়ম অনুসারে প্রবৃত্তিকে বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনই সততা, অর্থাৎ মানব জীবনে প্রবৃত্তি ও বিচারবুদ্ধি উভয়ের পরিমিত অবদান অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. সক্রেটিসের মতে সততা কি ?

ক. জ্ঞান
খ প্রবৃত্তি
গ. মিতব্যয়িতা
ঘ. সাহস।

২.প্লেটোর মতে মৌলিক সততা সংখ্যায় কয়টি ?

ক. চারটি
খ. পাঁচটি
গ. তিনটি
ঘ. দুইটি।

৩. সততাকে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে?

ক. চারটি
খ. পাঁচটি
গ. তিনটি
ঘ. দুইটি।

৪. এরিস্টটলের মতে সততা কি?

ক. সাহসিকতা
খ. উদারতা
গ. কার্পণ্য
ঘ. মধ্যপন্থা নির্বাচন করার অভ্যাস।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১. সততা কাকে বলে ?
২. সততা সম্পর্কে সক্রেটিসের ধারণা কি ?

রচনামুলক প্রশ্ন :

১. সততা কি ? সততা সম্পর্কে সক্রেটিস ও এরিষ্টটলের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. ব্যক্তিগত ও সামাজিক সততা কি ? বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : ১. ক ২. ক, ৩. খ, ৪. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. Mackenzie, A Manual of Ethics
২. P.B.Chatterjee, Principles of Ethics.

পাঠ-৩

নৈতিক প্রগতি ও এর শর্তাবলী

Ethical Development and Its Prerequisites

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ◆ নৈতিক প্রগতি কি বলতে পারবেন।
- ◆ নৈতিক প্রগতির শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ ব্যক্তির নৈতিক প্রগতির শর্তসমুহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

নৈতিক প্রগতি

ব্যক্তির আচরণের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বোধ সম্পর্কিত আলোচনা হচ্ছে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। নৈতিক প্রগতি ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে ব্যক্তির জীবনে পুর্ণতা এনে থাকে। ব্যক্তি মাত্রই একটা লক্ষ্য সামনে রেখে কর্মজীবন পরিচালনা করে থাকে। মানব জীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াকেই নৈতিক প্রগতি বলা হয়। এক্ষেত্রে নৈতিক প্রগতি বলতে অনৈতিক স্তর থেকে নৈতিক স্তরে পৌছানো নয়, বরং নৈতিকতার নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরের দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়াকে বুঝায়। নিরন্তর ও অব্যাহত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবনে যে বিভিন্ন পরিবর্তন আসে সে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে নৈতিক প্রগতির বিভিন্ন পর্যায়। নৈতিক প্রগতি সকল সময় এক পর্যায়ে থেকে অন্য পর্যায়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। তাই নৈতিক প্রগতি হলো নৈতিক জীবনের উচ্চতর অবস্থায় যাওয়া। নৈতিকতার পরিমন্ডলের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া নৈতিক প্রগতির মূলকথা।

পরম লক্ষ্যে না পৌছা পর্যন্ত এ নীতি অব্যাহত ধারায় চলতে থাকে। অবশ্য কখনও কখনও নৈতিক প্রগতি বাধাপ্রাপ্তও হয়ে থাকে, যেমন-সমাজে দুর্নীতি, অনাচার ইত্যাদি অসদগুণের অনুপ্রবেশ ঘটলে সমাজে নৈতিক প্রগতি অনেকাংশে ব্যাহত হয়। নৈতিক প্রগতির সীমা বলতে কিছু নেই। ব্যক্তি যত আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়, প্রগতি তত উচ্চ পর্যায়ের দিকে ধাবিত হবে।

নৈতিক প্রগতির শর্তসমুহ

নৈতিক প্রগতির শর্তগুলো হচ্ছে নৈতিক জগত, জগতের অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা, অপুর্ণতা বোধ, নৈতিক অর্ন্তদৃষ্টির গভীরতা, নতুন বাধ্যবাধকতা, নৈতিক পরিবর্তন ও পরিবেশের পরিবর্তন এবং আদর্শ জগত।

নৈতিক জগত : নৈতিক জগতই নৈতিক প্রগতির প্রধান শর্ত। প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি নৈতিক জগতে অবস্থার করে। এ নৈতিক জগত নৈতিক আদর্শ, নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্রিয়ার অভ্যাসগত রূপ ইত্যাদি উপাদান সমন্বয়ে গঠিত।

জগতের অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা : সমাজে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠান এবং অভ্যাসের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিলে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এ সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করার ফলে নৈতিক আদর্শ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অভ্যাসের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং নৈতিক উন্নতির পথ সুগম হয়। তাই নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে নৈতিক জগতের অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব রয়েছে।

অপুর্ণতা বোধ: নৈতিক জগত ও এর অভ্যন্তরীণ বিরোধিতাই নৈতিক প্রগতির জন্যে যথেষ্ট শর্ত নয়, অপূর্ণতা বোধও এক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। নৈতিকতার ধারণা সম্পর্কে যখন আমাদের চেতনা অসম্পূর্ণ থাকে, তখন কোন নৈতিক সংস্কারের শিক্ষার ফলে আমরা সচেতন হই এবং নৈতিক প্রগতি সাধিত হয়।

নৈতিক অন্তদৃষ্টির গভীরতা: দার্শনিক গ্রীণ সদগুণ সম্পর্কে গ্রীকদের ধারণা ও আধুনিক চিন্তাবিদদের ধারণার তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান যে, সদগুণের পরিসীমা আধুনিক কালে আরও বিস্তৃত হয়েছে। কেবল সদগুণের পরিসীমারই বিস্তৃতি ঘটেনি, এমনকি সদগুণ যে সূত্রের উপর নির্ভর করে সে সূত্রের ধারণার গভীরতাকেও সম্পৃক্ত করেছে।

নীতিবিদ সেথ (Seth) নৈতিক জীবনের বিবর্তন প্রক্রিয়ার আলোচনায় তিনটি পর্যায়ের কথা বলেন: ক. বাহ্যিক মত থেকে অভ্যন্তরীণ মতে গমন, খ. কঠোর সদগুণগুলোকে কোমল সদগুণের অধীনে আনা; গ. সদগুণের পরিসরের ব্যাপকতা।

ক. বাহ্যিক মত থেকে অভ্যন্তরীণ মতে গমন : নৈতিকতার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিধি-বিধানকে নৈতিকতার বিচার-বিবেচনার মানদন্ড বলে মনে করে। কিন্তু নৈতিক প্রগতি সম্পর্কীয় সচেতনতার মাধ্যমে বুঝতে পারে বহির্বিধি নৈতিক বিচার-বিবেচনার সঠিক মানদন্ড নয়। নৈতিকতা বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ থেকে উদ্ভূত নয়।

খ. কঠোর সদগুণগুলোকে কোমল সদগুণের অধীনে আনা: কঠোর সদগুণগুলোকে ক্রমাগত কোমল সদগুণে রূপান্তর এবং অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার সদগুণগুলোকে কল্যাণ ও স্বাচ্ছান্দের সদগুণে রূপান্তর করাই হচ্ছে নৈতিক প্রগতির দ্বিতীয় পর্যায়। ব্যক্তি তার নৈতিকতার প্রথম দিকে কঠোর সদগুণ, দৈহিক শক্তি, সাহস ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু যখন তার জীবনে প্রগতির দ্বিতীয় পর্যায় আসে, তখন সে এই কঠোর সদগুণগুলোকে কোমল সদগুণে অর্থাৎ সহানুভুতি, বদান্যতা, দয়া, ক্ষমা, সহনশীলতা, ধৈর্য্যশীলতা ইত্যাদির অধীনে নিয়ে আসে।

গ. সদগুণের পরিসরের ব্যাপকতা : ব্যক্তির মধ্যকার সদগুণগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিসর যতই ব্যাপকতর হতে থাকে এবং নৈতিক আদর্শের কাছাকাছি যেতে থাকে, ততই তার আত্মকেন্দ্রিক সদগুণগুলো পরকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপ নেয় এবং ফলে সে অপরাপর ব্যক্তির কল্যাণের কথা চিন্তা করতে থাকে।

ব্যক্তির নৈতিক প্রগতির শর্ত

ব্যক্তির নৈতিক প্রগতি বিকশিত হয়ে থাকে আত্মসংযম, অপরের প্রতি সহানুভুতি, ন্যায় নীতি ইত্যাদির প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে। ব্যক্তির নৈতিক প্রগতির জন্যে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্তের আলোচনা নিম্নে করা হলো।

ক. **বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন :** ব্যক্তির নৈতিক প্রগতির জন্যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন অপরিহার্য। বুদ্ধিবৃত্তির সুষ্ঠু অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি অন্যান্য কর্মকে ন্যায় কর্ম থেকে পৃথক করতে পারে। ফলে সে অন্যায়কে পরিহার এবং ন্যায়কে গ্রহণ করতে পারে। বুদ্ধির অনুশীলন ব্যতীত নৈতিক আদর্শ ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। সক্রেটিস বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

খ. **সদগুণের অনুশীলন :** সদগুণের অনুশীলন প্রয়োজন এবং এর মাধ্যমেই সৎ অভ্যাস গঠিত হয়। সাহসিকতা, মিতাচার বা সংযম, দানশীলতা, উদারতা, মহানুভবতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নম্রতা, বন্ধুত্ব, সত্যবাদিতা, হাস্যরস, শালীনতা ও ক্রোধপ্রবণতা রোধ প্রভৃতি সদগুণের অনুশীলন করা দরকার। প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন দেশে সদাচার, বিচার, বিনয়, বিদ্যা ইত্যাদিকে সদগুণ হিসাবে ধরা হয়। মহাভারতেও কতকগুলো সদগুণের উল্লেখ দেখা যায়, যেমন- আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থস্থান দেখা, নিষ্ঠা, বৃত্তি, স্তর, দান এবং এই নয়টিকে মহাভারতে কুল লক্ষণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মজিদেও মুসলমানদেরকে মধ্যম পন্থা-ধৈর্য্য, দানশীলতা বিনয়, মিতব্যয়িতা, শালীনতা, প্রতিজ্ঞা পালন, সৎ সাহস, ন্যায়পরায়নতা, উদারতা, সদ্ভাব, কৃতজ্ঞতা, পরোপকারিতা ইত্যাদি সদগুণ অনুশীলনের জন্যে বলা হয়েছে।

গ. মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ: মনীষীদের জীবনী পাঠ ব্যক্তির নৈতিক প্রগতিতে প্রভূত সাহায্য করে। মনীষীদের জীবনী পাঠের জ্ঞান ব্যক্তির ক্রিয়া-কলাপের উপর শুভ প্রভাব ফেলে। এ প্রভাবের ফলেই ব্যক্তির মন থেকে তুচ্ছতা, হীনতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা দূরীভূত হয়।

ঘ. **সৎ সংসর্গ:** ব্যক্তির নৈতিক প্রগতিতে সৎ সংসর্গের প্রভাব অনস্বীকার্য। ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা পরিহার করা এবং সৎ লোকের সাথে চলাফেরা করা। আর এতে ব্যক্তির নৈতিক প্রগতির পথ অনেকাংশে প্রশস্ত হয়।

ঙ. **আত্মসংযম :** আত্মসংযম ব্যক্তির নৈতিক প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন ব্যক্তি যদি আত্মসংযমের মাধ্যমে ষড়রিপুকে দমন করতে না পারে, তাহলে তার নৈতিক প্রগতি ব্যাহত হয়। তাই নৈতিক প্রগতির জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সংযমী হতে হবে।

চ. **অনুতাপ :** ব্যক্তিকে নৈতিক প্রগতি অর্জন করতে হলে অনুতাপের মাধ্যমে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে দমন করতে হবে। ভুলবশত: বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেউ যদি কোন অন্যায় করে থাকে, তাহলে তার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। ব্যক্তির অনুশোচনা নৈতিক শাস্তি হিসাবে কাজ করে।

ছ. **সামাজিক পরিবেশ :** যে সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি তার জীবন চালিত করে সে পরিবেশও ব্যক্তির নৈতিক প্রগতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পরিবেশ নৈতিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিরূপ হলে নৈতিক প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই এরিষ্টটল রাষ্ট্রের সুশাসক ও সুনাগরিক তৈরী করার ক্ষেত্রে নীতিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

সারকথা:

নৈতিক প্রগতি ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে ব্যক্তির জীবনে পূর্ণতা এনে দেয়। মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াকেই নৈতিক প্রগতি বলা হয়। নিরন্তর ও অব্যাহত প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে ব্যক্তির জীবনে যে বিভিন্ন পরিবর্তন আসে সেই পরিবর্তনগুলো হচ্ছে নৈতিক প্রগতির বিভিন্ন পর্যায়। নৈতিক প্রগতিরশর্তগুলো হচ্ছে নৈতিক জগত, জগতের অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা, অপূর্ণতার বোধ, নৈতিক অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা, নতুন বাধ্যবাধকতা, আদর্শ জগত ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. নিচের কোন্‌টি সদগুণ ?

ক. কাম
খ. ক্রোধ
গ. ভয়
ঘ. ক্ষমা।

২. নিচের কোন্‌টি নৈতিক প্রগতির শর্ত নয় ?

ক. নৈতিক জগত
খ. সাম্প্রদায়িক পরিবেশ।
গ. নৈতিক অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা।
ঘ. অপূর্ণতা বোধ ।

৩. নিচের কোন্‌টি অসদ্‌গুণ?

ক. বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন
খ. আত্মসংযত
গ. দুর্নীতি
ঘ. উদারতা।

৪. আত্মসংসম ব্যক্তির কোন্ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে?

ক. নৈতিক ভাবাবেগে
খ. বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে
গ. নৈতিক অবদমনে
ঘ. নৈতিক প্রগতিতে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন :

১. নৈতিক প্রগতি কাকে বলে ?
২. নৈতিক প্রগতির শর্তসমুহ কি ?

রচনামুলক প্রশ্ন :

১. নৈতিক প্রগতির শর্তসমুহ আলোচনা করুন।
২. ব্যক্তির নৈতিক প্রগতির শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করুন ।

উত্তর : ১. ঘ ২. খ, ৩. গ, ৪. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. William K. Frankena, Ethics
২. মুহম্মদ আবদুল বারী, নীতিবিদ্যা।

পাঠ-৪

অধিকার ও কর্তব্যের স্বরূপ

(The Nature of Rights and Duties)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মানুষের নৈতিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহের স্বরূপ কি জানতে পারবেন।
- মানুষের নৈতিক অধিকারসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অধিকারের স্বরূপ

অধিকারের ধারণাটি কম-বেশি সব নীতিবিদই বিভিন্নভাবে নীতিবিদ্যার আলোচনায় উপস্থাপন করেছেন। উইলিয়াম লিলির মতে, আইনসঙ্গত বা নৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে কোন কিছু পাওয়ার বা কোন নির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করার যুক্তিসঙ্গত বা যুক্তিসম্মত দাবীকে অধিকার বলা হয়। উল্লেখ্য যে, আইনসঙ্গত অধিকার ও নৈতিক অধিকার এক নয়। আইনসঙ্গত অধিকারের সংরক্ষণ ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিচারালয়ে আইনের সাহায্য নেওয়ার প্রশ্ন উঠে। পক্ষান্তরে, নৈতিক অধিকার রাষ্ট্র বা বিচারালয়ের আইনের বলে অর্জিত হয় না। নৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আইনসঙ্গত অধিকারের চেয়ে নৈতিক অধিকারই নীতিবিদ্যার আসল আলোচ্য বিষয়। স্মরণযোগ্য যে, নৈতিক অধিকার সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যেমন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি সমাজও ব্যক্তির নৈতিকতার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। প্রয়োজন অনুসারে সমাজ মানুষের অধিকারের সীমারেখাও নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। মানুষের নৈতিকতা বিকাশের প্রাথমিক পদক্ষেপই হলো তার নৈতিক অধিকার। অধিকার ব্যতিত কোন মানুষ মানবিক জীবন যাপন করতে পারে না। মানুষের নৈতিক অধিকারের দু'টি শর্ত আছে। যথা :-

ক. সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির বিনা বাধায় তার অধিকার ভোগ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং খ. প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তার অধিকার নিজের ও সমাজের অপরাপর ব্যক্তির কল্যাণে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। উলে-খিত শর্ত দুটি ব্যতিত কোন অধিকারকে সমাজ স্বীকার করে নেয় না। সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত, গৃহীত ও অনুমোদিত নৈতিক দাবীই হলো মানুষের নৈতিক অধিকার।

মানুষের নৈতিক অধিকারসমূহ

মানুষের প্রধান কতকগুলো অধিকার রয়েছে; যেমন- ক. বাঁচার অধিকার খ. কাজ করার অধিকার, গ. স্বাধীনতার অধিকার, ঘ. সম্পত্তির অধিকার, ঙ. শিক্ষার অধিকার, চ. চুক্তির অধিকার। নৈতিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে এ অধিকারগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বলে নীতিবিদ্যায় এগুলোর আলোচনা করা হয়। এবার মানুষের মুখ্য অধিকারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব।

ক. বাঁচার অধিকার : বাঁচার অধিকারই হলো মানুষের অধিকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। সুস্থ সমাজ জীবন যাপন করার অধিকার যদি মানুষ না পায়, তাহলে নৈতিকতা বা নৈতিক প্রগতি ব্যাহত হয় এবং ফলে ব্যক্তি যেমন নিজের কল্যাণ সাধন করতে পারে না, তেমনি সে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতেও ব্যর্থ হয়।

কোন কোন সময় আমরা মানুষের বাঁচার অধিকারকে অস্বীকার করি। কোন ব্যক্তি যদি তার নিজের বাঁচার অধিকারকে ভোগ করে, তাহলে তার উচিত অপরকে বাঁচতে দেওয়ার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। বাঁচার অধিকার সমানভাবে না থাকলে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

খ. **কাজ করার অধিকার :** মানুষের বাঁচার অধিকারের স্বীকৃতির মধ্যেই তার কাজ করার অধিকার নিহিত। মানুষকে প্রাণে বাঁচাতে হলে তার খাদ্য, বস্ত্র, ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হয, আর এগুলোর সংগ্রহের জন্যে তাকে কাজ করার অধিকার দিতে হয়।

গ. **স্বাধীনতার অধিকার :** স্বাধীনতা হলো মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নৈতিকতার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য শর্ত। ব্যক্তিগত স্বাধীনার মাধ্যমেই মানুষ তার স্বীয় কল্যাণ অর্জন করতে পারে। অবশ্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তি তার খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কাজ করবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থই হলো নিজের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তাকে রক্ষার জন্যে অপরের স্বাধীনতায় হস্ড়ক্ষেপ না করে তার স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা।

ঘ. **সম্পত্তির অধিকার :** মানুষের নৈতিকতার জন্যে যেমন তার স্বাধীনতার প্রয়োজন, তেমনি সম্পত্তির অধিকারও মানুষের জীবনের স্বাধীনতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। সম্পত্তির অধিকার মানুষের নিজের মঙ্গলের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যেও যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করার বিষয়কে জড়িত করে।

ঙ. **শিক্ষার অধিকার :** শিক্ষা অর্জনের অধিকারের স্থান মানুষের বাচাঁর অধিকারের পরেই। শক্তি-সামর্থ্যনুযায়ী শিক্ষা লাভের অধিকার মানুষের জম্মগত। শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে কারোও পক্ষে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা কষ্টসাধ্য। সুষ্ঠু শিক্ষার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ নিহিত। শিক্ষার এ দিকটিকে লক্ষ্য করেই সক্রেটিস বলেন যে, জ্ঞানই সদগুণ।

চ. **চুক্তির অধিকার :** সমাজে বসবাস করতে হলে চুক্তির অধিকার থাকা খুবই প্রয়োজনীয়। নৈতিকতা আমাদের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে এবং মানুষের স্বাধীনতাই মানুষকে তার সম্পত্তি এবং কাজ করার অধিকার রক্ষা করার জন্যে অপরের সাথে চুক্তি বন্ধনে আবদ্ধ করে। সম্পত্তি থাকলে তাকে রক্ষা করার বা কাজ করার অধিকারের জন্যে চুক্তি খুবই আবশ্যক।

কর্তব্যের স্বরূপ

অধিকার ও কর্তব্য সমাজস্থ মানুষের সঙ্গে জড়িত। আমরা যেসব নৈতিক অধিকার ভোগ করি সেই অধিকারগুলোই পরোক্ষভাবে আমাদের উপর কর্তব্য চাপিয়ে দেয়।

আমার বাচাঁর অধিকার যেমন আমার কাছে খুবই প্রয়োজনীয়, তেমনি আমার মতো অন্য ব্যক্তিও যাতে বাঁচতে পারে, সে দিকে খেয়াল রাখাও আমাদের মৌলিক কর্তব্য। নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী যেসকল কাজ আমাদের করা উচিত সেগুলোকে কর্তব্য বলা হয়। নৈতিক দায়িত্ববোধের সাথে নৈতিক কর্তব্যবোধ সম্পৃক্ত এবং নৈতিক কর্তব্যবোধের সাথে কর্তব্য সম্পাদিত করার নৈতিক বাধ্যতাবোধ সম্পৃক্ত।

কর্তব্য হচ্ছে মানুষের এমন এক নীতিনিষ্ঠ আচরণ, যা সকল সময়ই সর্বপ্রকার মানুষ পালন করতে বাধ্য থাকে। নৈতিক কর্তব্য নিয়মিত পালন করার মানসিক প্রবণতা বা অভ্যাস থেকেই মানুষের মধ্যে সদগুণ গড়ে উঠে এবং কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়েই সদগুণ প্রকাশিত হয়ে থাকে। কর্তব্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে ম্যাকেনজী বলেন যে, কর্তব্য হচ্ছে এমন এক বিশেষ ধরণের কাজ- যা আমাদের করা উচিত।

কর্তব্যের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন :

১. কর্তব্য হচ্ছে ন্যায় কাজ, যা অনেক লোকই পরিহার করতে প্রবৃত্ত হয় ;

২. কাজটি যে করছে তার চেয়ে অন্যের উপরই কর্তব্যের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বর্তে বলেই আমাদের মধ্যে কর্তব্যকে পরিহার করার প্রবণতা দেখা দেয় ;

৩. কর্তব্য এমনভাবে অনুমোদনের ভাবাবেগ উদ্রেক করে, যা নিছক ন্যায় কাজ করে না।

কর্তব্যকে কেউ কেউ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ; যেমন-আত্মকেন্দ্রিক, পরকেন্দ্রিক ও আদর্শ কেন্দ্রিক। আবার কেউ কেউ দু'ধরনের কর্তব্যের কথা বলেছেন, যেমন- নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট কর্তব্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তির জ্ঞান সুস্পষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে অনির্দিষ্ট কর্তব্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকে না।

মানুষের নৈতিক কর্তব্যসমূহ

মানবোচিত জীবন যাপনের জন্য মানুষের যেমন কতকগুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে, তেমনি সমাজের প্রতিও মানুষের কতকগুলো কর্তব্য রয়েছে। ম্যাকেন্‌জী মানুষের প্রধান প্রধান কর্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কর্ত্যব্যগুলোকে মানুষের মৌলিক কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন:-

ক. **জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা :** 'হত্যা কান্ডে লিপ্ত থাকা উচিত নয়'- এ আদেশটি পালন করা হচ্ছে মানুষের একটা প্রধান নৈতিক কর্তব্য। সমাজে কোন ব্যক্তির যেমন বাচাঁর অধিকার রয়েছে তেমনি অপর ব্যক্তিরও বাচাঁর অধিকার রয়েছে। আমাদের জীবনের প্রতি আমাদের যেমন শ্রদ্ধা রয়েছে তেমনি অপর ব্যক্তির জীবনের প্রতিও শ্রদ্ধা থাকা আমাদের কর্তব্য।

খ. **স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা :** ব্যক্তির নিজের ও অপরের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ব্যক্তির আরেকটি প্রধান কর্তব্য। দাসত্ব, স্বেচ্ছাচারীতার স্বরূপই হচ্ছে নীতি-বিগর্হিত কাজ এবং এ ধরনের কাজ আমাদের কর্তব্যের পরিপন্থী।

গ. **চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা :** কেবল জীবন ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই আমাদের কর্তব্য নয় বরং চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধও আমাদের আরেকটি কর্তব্য। হেগেল বলেন, মানুষ হও এবং অপরকে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো।

ঘ. **সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা :** নিজের সম্পত্তি নষ্ট করা বা অপব্যবহার করা যেমন অন্যায় তেমনি অপরের সম্পত্তির ব্যবহার বা হরণও অন্যায় বলে মনে করা আমাদের কর্তব্য। সুতরাং নিজের সম্পত্তিকে রক্ষা করা যেমন আমাদের কর্তব্য, তেমনি অপরের সম্পত্তি রক্ষা করাও আমাদের সবার নৈতিক কর্তব্য।

ঙ. **সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা :** নৈতিক প্রগতির স্বার্থে প্রত্যেক সমাজ তার সদস্যদের সুবিধা ও অসুবিধার বিবেচনা করে তার উপর কতকগুলো বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে। সমাজের এসব বিধি-নিষেধ পালন করা সমাজস্থ সদস্যদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাই সুস্থ সমাজ জীবনের জন্যে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য।

চ. **সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা :** মিথ্যা বলা উচিত নয়- এ নৈতিক নিয়মটি দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করে। এক দিকে নৈতিক নিয়মটি বলে যে, আমাদের কথার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি থাকা দরকার। অপরদিকে এই নৈতিক নিয়মটি বলে যে, আমাদের চিন্তার সঙ্গে আমাদের কথার সঙ্গতি থাকা দরকার। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে আমাদের চিন্তা, কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকা একান্ত কর্তব্য।

ছ. **প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা :** প্রগতিতে বিশ্বাস রেখে, প্রগতি অনুসারে কাজ করাও আমাদের একটা প্রধান নৈতিক কর্তব্য। অবশ্য কাজ হচ্ছে এক ধরনের প্রার্থনা বা উপাসনা। কাজেই সমাজের প্রগতির স্বার্থে সাধ্য অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। আর একেই বলে প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা।

কর্তব্যের বিরোধিতা

দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে মানুষ তার বৈচিত্র্যময় জীবনে বিচিত্রধর্মী কর্তব্যের সম্মুখীন হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের কর্তব্যের মধ্য থেকেই আমরা জীবন রক্ষা করা ও সত্য কথা বলাকে নৈতিক কর্তব্য বলে ধরে নেই। কিন্তু অনেক সময় এ দু'টি কর্তব্যের মধ্যে বিরোধিতা দেখা যায়। অর্থাৎ সত্য কথা বলা এবং অন্যের জীবন রক্ষা এ দু'টি কর্তব্যের মাঝে বেশীর ভাগ সময়ই বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। যখনি আমরা এক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আরেক কর্তব্যের সম্মুখীন হয়ে পড়ি তখন তাকে কর্তব্যের বিরোধিতা বলা হয়।

বিভিন্ন নীতি-দার্শনিকগণের মতে কর্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধিতা থাকতে পারে না। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। এ বিচার-বুদ্ধিই কর্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধিতা সৃষ্টি করে না। উদাহরণস্বরূপ গ্রীণ বলেন যে, বাস্তবে কর্তব্যের বিরোধিতা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সমালোচকদের কেউ কেউ আবার এ-ও উল্লেখ করেন যে, নৈতিক আদর্শের মধ্যে কর্তব্যের কোন বিরোধিতা নেই। কামনা, বাসনা, ভাবাবেগ, ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রভৃতির দ্বারা চালিত হয়ে আমরা অনেক সময় কর্তব্যের বিরোধিতা

সম্মুখীন হই। কিন্তু বিচার বিবেচনার ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শে পৌছার ক্ষেত্রে এসকল বিষয়গুলোর কোন স্থান নেই, সেহেতু যথার্থ নৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে কর্তব্যের বিরোধিতার প্রশ্ন অবান্তর।

নৈতিক বিচারে আত্মোপলব্ধি যদি মানুষের যথার্থ নৈতিক আদর্শ বা সর্বোচ্চ কর্তব্য হয় তাহলে তার মধ্যে কর্তব্যের বিরোধিতা থাকতে পারে না। কারণ আত্মোপলব্ধি তখনই সম্ভব হয় যখন তার মধ্যে কোন বিরোধিতা থাকে না। তাই এটা বলা হয়ে থাকে যে, ব্যক্তি সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে কর্তব্যের বিরোধিতাকে দূরীভুত করতে পারে।

সারকথাঃ

নৈতিক ভিত্তির উপর বা আইনসঙ্গতভাবে কোন কিছু পাওয়ার বা কোন নির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করার যুক্তিসঙ্গত বা যুক্তিসম্মত দাবিকে অধিকার বলা হয়। তবে আইনসঙ্গত অধিকার ও নৈতিক অধিকার এক নয়। নৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। নৈতিক অধিকার সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। মানুষের নৈতিক অধিকারসমূহের মধ্যে রয়েছে বাঁচার অধিকার, কাজ করার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার চুক্তির ইত্যাদি। নৈতিকতার বিকাশের ক্ষেত্রে এ অধিকারগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই মানুষের নৈতিক বিকাশের প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো তার নৈতিক অধিকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. মানুষের নৈতিক অধিকারের শর্ত কয়টি ?

ক. দুইটি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি।

২. কর্তব্য কি ?

ক. নীতিনিষ্ঠ আচরণ
খ. অপরিহার্য আচরণ
গ. আবশ্যকীয় প্রাপ্তি
ঘ. দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন।

৩. নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা কি ধরনের শর্ত?

ক. আরিহার্য
খ. মূখ্য
গ. গৌণ
ঘ. উপরের কোনটি না।

৪. নৈতিক দায়িত্ববোধের সাথে কিসের সম্পৃক্ততা জরুরি?

ক. নৈতিক চরিত্রের
খ. নৈতিক প্রগতির
গ. নীতিহীনতার
ঘ. নৈতিক কর্তব্যবোধের।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন :

১. অধিকার কাকে বলে ?
২. কর্তব্য কাকে বলে ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. মানুষের নৈতিক অধিকারসমূহ কি ? আলোচনা করুন।
২. মানুষের নৈতিক কর্তব্যসমূহ কি ? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ১. ক ২. ক, ৩. ক, ৪. খ।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১.মুহম্মদ আব্দুল বারী, নীতিবিদ্যা।

পাঠ-৫

সভ্যতা
Civilization

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সভ্যতা কাকে বলে বলতে পারবেন ।
- প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন রোমান সভ্যতার বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সভ্যতার সংজ্ঞা

সৃষ্টির শুরু থেকে যাযাবর মানুষের সংগ্রামী জীবন যাত্রাকে গঠনমূলক রূপ দিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Arnold Toynbee -এর মতে পৃথিবীর ইতিহাস, বিভিন্ন কৃষ্টির ক্রম বিকাশ আর কৃষ্টির সমন্বয়ে সভ্যতার সৃষ্টি। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিশেষ বিশেষ কৃষ্টির উদ্ভব হয়েছিল তাকেই সাধারণত প্রাচীন সভ্যতা বলা হয় কৃষ্টি অপেক্ষা সভ্যতার অর্থ আরও ব্যাপক।

মানব ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সে স্তরকেই সভ্যতা গণ্য করা হয়, যখন আবিষ্কৃত হয়েছে লিখন পদ্ধতির, উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে শিল্প ও বিজ্ঞানের, উন্নতি সাধিত হয়েছে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও ধর্মীয় অবস্থার। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের মাধ্যমেই সভ্য যুগের উদ্ভব ঘটে। সভ্য যুগের দু'টি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- (ক) মানুষের লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। অর্থাৎ মানুষ তার ধ্যান ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি লিখে প্রকাশ করে পাথরের গায়ে, তামার পাতে, কাদার পেটে বা কাগজে। (খ) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল-মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পুরাতন গ্রাম্য সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলে নগর সংস্কৃতি। সে দিনের নগর সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আজকের নতুন প্রজন্মের নতুন নগর সংস্কৃতি।

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ থেকে বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় বলে ধারণা করা হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী, মিশরের নীল নদ, ভারতের সিন্ধু নদ, চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং নদীর অববাহিকায়। এ সকল নদীবিধৌত অঞ্চলে নিয়মিত পানি সরবরাহ, উর্বর ভূমি, যানবাহনের সুযোগ, মৎস্য সম্পদ, বনজ সম্পদ ইত্যাদি কারণে সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। প্রাচীন সভ্যতায় যথাক্রমে- শিরীয়, সুমেরীয়, হিব্রু, পারসিক, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার আর্বিভাব ঘটে ও পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়।

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা

প্রাচীন গ্রীসের অধিবাসীদের গ্রীক জাতি বলা হয়। এ জাতির পূর্ব পুরুষ ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলা এক মেষপালক আর্য গোষ্ঠী। খিস্ট্রপূর্ব ৩০০০ অব্দে জনসংখ্যা তুলনামুলকভাবে বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্য জাতির এ বংশধরেরা তাদের আদি নিবাস দানিয়ূব নদীর তীরে অবস্থিত তৃণভূমি অঞ্চল থেকে ইজিয়ান অঞ্চল পর্যন্ড় ছড়িয়ে পড়ে। তারা কালক্রমে ডোরীয়, আওনীয়, ইওনীয় এবং এচিত্ত নামে পরিচিত হয় এবং ইজিয়ান অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়ে তোলে।

মানব সভ্যতায় গ্রীকদের অবদান : প্রায় ১০০ বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রীক জাতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে গ্রীক জাতির ইতিহাস উম্মোচিত হয়। প্রাচীন গ্রীক কবি হোমার রচিত ইলিয়াদ এবং ওডিসি দুই মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনাবলী অনুমান করে খনন কার্য পরিচালিত হয়। তাতে করে মহাকাব্যে বর্ণিত অনেক তথ্য যথার্থ বলে জানা যায়। নিম্নে বিশ্ব সভ্যতায় গ্রীকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. দর্শন : বিশ্ব সভ্যতায় গ্রীকদের অন্যতম অবদান ছিল দর্শনে । পৃথিবীর সৃষ্টি, এর পরিভ্রমণ, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদির কারণ খুঁজতে গিয়ে গ্রীসে দর্শন চর্চার সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীন গ্রীসে কয়েকজন বিখ্যাত যুক্তিবাদী দার্শনিক ছিলেন। যুক্তিবাদী দার্শনিকদেরকে বলা হত সফিষ্ট। সুশাসক পেরিক্লিস সফিষ্টদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ট দার্শনিক। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ, আদর্শ রাষ্ট্র, সৎ নাগরিক সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা তরুণদের আকর্ষণ করে। এতে শাসক শ্রেণী ভীত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে তরুণদের বিপথে পরিচালনার অভিযোগ আনে। অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে বিচারে তাকে হেমলক বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

সক্রেটিসের ছাত্র প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের স্বাপ্নিক ছিলেন। তাঁর রচিত রিপাবলিক গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের ধ্যান ধারণা পাওয়া যায়। তিনি তাঁর শিক্ষক সক্রেটিসের বক্তৃতামালা নিয়ে ডায়ালগস অব সক্রেটিস নামে অপর এক গ্রন্থ রচনা করেন।

২. ইতিহাস ও সাহিত্য : গ্রীকরা স্মরণীয় অবদান রেখে গেছে ইতিহাস রচনায়। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস-কে ইতিহাসের জনক বলা হয়। থুগিডাইডস প্রাচীন গ্রীসের একজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও গ্রীকদের অসামান্য অবদান রয়েছে। অন্ধ কবি হোমারের ইলিয়াড ওডিসি মহাকাব্য বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গ্রীক জাতির ঐতিহ্য এবং বীরদের দু:সাহসিক অভিযানের অপূব বর্ণনা দেখা যায় এ দুই মহাকাব্যে। কবি গেসিয়াড, সাম্পো, পিন্ডার গ্রীক যুগের বাস্তববাদী সাহিত্যিক কবি ছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রীকদের অন্যতম অবদান ছিল রঙ্গমঞ্চ তৈরি ও নাটক করা।

খোলা আকাশের নিচে বৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চ প্রথম তেরি হয়েছিল গ্রীস দেশে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উৎসবের সময়ে মঞ্চে অভিনয় হত। গ্রীসের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন এসকাইলাস বা এক্রিলাস। তাঁর অন্যতম রচনা ট্রাজেডি নাটক বন্দী প্রমিথিউস মহান গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের আন্তিগোনে একটি উল্লেখযোগ্য ট্রাজিক নাটক ছিল। তিনি প্রায় একশতেরও বেশি নাটক রচনা করেন।

৩. অলিম্পিক খেলা : প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রীকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান অলিম্পিক খেলা প্রর্বতন। যা এখনও পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীসে বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এবং ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা হিসেবে অলিম্পিক খেলা ৭৭৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে শুরু করা হয়। প্রতি চার বছর অন্তর গ্রীসের অলিম্পিয়া শহরে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রীসের বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া কুশলীরা দৌড়, ঝাপ, মল-যুদ্ধ, চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা ছোঁড়া ও মুষ্টিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। অলিম্পিক খেলার মাসকে পবিত্র বলে মনে করা হত। এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল।

৪. বিজ্ঞান : বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে গ্রীকরা উলে-খযোগ্য অবদান রেখে গেছে। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পৃথিবীর জম্ম রহস্যের উদ্‌ঘাটনে তারা অক্লান্ড় পরিশ্রম করে গেছেন। এথেনীয় মহাবিজ্ঞানী ডেমোক্রিতাস প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছেন। আমাদের এ বিশ্ব যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দ্বারা গঠিত এ ধারণা তিনিই প্রথম দিয়ে গিয়েছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের গ্রীক পন্ডিত এরিস্টটল সর্ব বিষয়ে অসাধারণ পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন। গ্রীক গণিতবিদ পীথাগোরাস খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ট শতকে জম্ম গ্রহণ করেছিলেন।

৫. ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলা : স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গ্রীকরা অপূর্ব শিল্প নৈপূণ্য ও দক্ষতার চিহ্ন রেখে গেছেন। মন্দির ও প্রস্তর মূর্তি নির্মাণে, পুস্পাধারে অঙ্কিত চিত্র কলায় গ্রীকদের অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ লাভ ঘটে। অপূর্ব কারুকার্যমন্ডিত স্তম্ভের ওপর তারা প্রাসাদ নির্মাণ করত। এথেন্সের পার্থেনয় মন্দির তাদের স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

দেব-দেবী, বীর ও সমকালীন লোকজনের মূর্তি গ্রীক ভাস্করগণ এমনভাবে তৈরি করতেন যে তাতে অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠত। ফিদিয়াস, মাইরন, প্রাকসিটেলেস খ্যাতিমান ভাস্কর ছিলেন।

৬. শিক্ষা ও সঙ্গীত : হোমারীয় যুগের শেষভাগে ফিনিসীয়দের লিপির সাথে গ্রীকদের পরিচয় ঘটে। ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে স্বরবর্ণ যুক্ত করে গ্রীকরা মোট ২৪টি অক্ষরের বর্ণমালা উদ্ভাবন করে। গ্রীকরা পাপিরাসের ওপর এবং মাটির প্লেটে লিখত। গ্রীকের অধিবাসীগণ বই পড়া খুব ভালবাসত। গ্রীক

বাসীর সন্তানেরা সাত বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া আসা করত। কৃষক ও কারিগরের সন্তানেরা প্রাথমিক শিক্ষা পেত। দাসদের ছেলেদের জন্যে বিদ্যালয়ের দ্বার বন্ধ ছিল।
ছবি আঁকা, নাচ গান এবং লিরা বাদ্য যন্ত্র বাজান শেখান হত তরুণদের। ধর্মীয় উৎসবে গান গাওয়ার প্রয়োজনে গ্রীকদের সঙ্গীতের বিকাশ ঘটে এবং বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে তারা দক্ষ হয়ে উঠে।
মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশে গ্রীক সভ্যতা দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভাস্কর্য স্থাপত্য ও শিল্পকলা এবং শিক্ষা সঙ্গীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে।

প্রাচীন রোমান সভ্যতা

প্রাচীন রোমান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন রোম নগরীকে কেন্দ্র করে। বর্তমান ইতালির পশ্চিমে দক্ষিণ ভূমধ্যাসাগরের উপকুলে রোম নগরী অবস্থিত। রোম নগরী সাতটি পার্বত্য টিলার উপর ছিল। নগরের চারিদিকে ছিল উর্বর সমতল ভূমি। এ সমতল ভূমিতে বাস করত ল্যাটিন উপজাতি। ল্যাটিন রাজা রোমিট্রলাস পত্তন করেন এক নগরী। তাঁর নামেই নগরীর নামকরণ করা হয় রোম। রোমবাসীরা কথা বলত ল্যাটিন ভাষায়।

রোমান সভ্যতার অবদান : রোমানরা গ্রীসের ভাষা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সাথে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়েছিল। তাদের এ পরিচিতি আরও বৃদ্ধি পায়-যখন রোমবাসীরা গ্রীস দখল করে। অবশ্য রোমের সংস্কৃতি গ্রীসের শুধু অনুকরণ ছিল না-গ্রীকদের কাছে শিখে তারা নতুন অনেক কিছু সুষ্টি করেছিল। নিচে রোমান অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **বর্ণমালা সৃষ্টি :** রোমানরা গ্রীক বর্ণমালার ভিত্তিতে লাতিন বর্ণমালা সৃষ্টি করে।

২. **সাহিত্য :** সাহিত্য রচনায় রোমান সভ্যতা অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাকে ছাড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞানী ও কবি লুক্রেৎ সিউস বস্তু প্রকৃতি নামে একটি কাব্য রচনা করেছেন। এ কাব্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে বহু প্রতিভাবান কবি রোমে বাস করতেন। এদের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত কবি ছিলেন ভেগিলিউস। তাঁর মহাকাব্য ইনিস (Aeneis) বহু ভাষায় অনুদিত রয়েছে। ওভিদ ও লিভি রোমীয় যুগের খ্যাতিমান দুই কবি ছিলেন।

৩. **দর্শন ও ইতিহাস :** রোমের জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদের নাম ছিল ষ্টোয়িকবাদ। এ মতবাদ অনুসারে সুখ লাভের জন্যে প্রয়োজন শৃঙ্খলা, শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সত্যবাদী হওয়া।

৪. **স্থাপত্য শিল্প :** রোমের বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ ইমারতগুলো রোমীয় সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রাচুর্য্যের বহি:প্রকাশরূপে উপস্থিত। রোমে আবিস্কৃত কংক্রীট স্থাপত্য শিল্পে তাদের নতুন অবদান। কংক্রীট শক্তভাবে পাথর জোড়া লাগাত। ফলে সে সময়ে খিলান ও নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। রোমীয় স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন ধর্ম মন্দির প্যান্থিত্তন।

৫. **ভাস্কর্য শিল্প :** রোমীয় ভাস্কর্যের অপূর্ব সাফল্য হল অবিকলভাবে মানুষের পূর্ণাবয়ব ও আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ। এ মূর্তি নির্মাণে মানুষের মনোজগত মুখায়বে জীবন্তভাবে চিত্রিত করা। রোম সম্রাট, কর্মকর্তা ও দেবতাদের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে যা রোমীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন বলে মনে করা হয়।

৬. **ধর্ম :** রোমীয় ধর্মে গ্রীকদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রোমে বহু ধর্ম মন্দির নির্মিত হয়েছিল। রোমবাসীদের প্রধান দেবতার নাম জুপিটার। নেপচুন, ভেনাস, মিনার্ভা তাদের অন্যতম দেব-দেবী ছিল। অগাষ্টাস সিজারের সময়কাল থেকে সম্রাটদের ঈশ্বর বলে পূজা করা হত। শেষের দিকে রোমে খ্রিস্ট ধর্ম প্রসার লাভ করে। খ্রিস্টধর্ম সম্রাট পূজা সমর্থন করে না। ফলে প্রথম দিকে রোমান শাসকেরা খ্রিস্ট ধর্মের বিরোধী ছিল। দরিদ্র কৃষক, কারিগর ও দাসগণ খ্রিস্টধর্মকে জীবন ধারণের এক অবলম্বন মনে করে এবং রোম সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রসার লাভ করে। সমাজে বিশৃঙ্খলা নিরসনের জন্যে অবশেষে সম্রাট কনষ্টানটাইন খ্রিস্ট ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দান করেন।

৭. **আইন :** যেহেতু রোম শাসন ব্যবস্থার বিরাট বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়েছিল তাই রোমানদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রকাশ পায় তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে। রোমান আইন লিখিত এবং অলিখিত দু'ই ছিল। অভিজাতদের (প্যাট্রেশিয়ান) সাথে সাধারণ নাগরিকের (প্লেবিয়ান) সংঘাতের ফলে সাধারণ মানুষের কল্যাণে আইন প্রণীত হতে থাকে। ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে এ আইন

লিখিত হয়। হেবিয়াস কোর্পাস নামে এ আইন পরিচিত ছিল। বেসামরিক আইন, জনগণের আইন এবং আইনের নতুন বিন্যাস-এ তিনটি শাখায় রোমান আইন বিকাশ লাভ করে।

বেসামরিক আইন পালনে নাগরিকেরা বাধ্য ছিল। রোমান আইনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হত। এ আইন ছিল উদার ও মানবিক। এ আইনে বিধবা ও এতিমদের অধিকার সংরক্ষিত ছিল।

৮. **রোমান সংস্কৃতির প্রভাব :** রোমান সংস্কৃতির প্রভাব ইতালি ছাড়াও সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানে তারা গিয়েছে সেখানে তারা খিলান, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, এ্যামিক থিয়েটার ও পথ নির্মাণ করত। দূর-দূরান্ত অঞ্চলে ল্যাটিন ভাষা ব্যবহৃত হত। প্রাচ্যের ও গ্রীসের বহু রচনা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পশ্চিম ইউরোপের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ ভাষায় লিখত ও পড়ত। খনিজ দ্রব্য, উদ্ভিদ ও পশু-পাখি ইত্যাদির নামকরণের সাধারণ ভাষা হল-ল্যাটিন।

পৃথিবীর সকল দেশের বিজ্ঞানীরা এ ভাষাতেই এগুলো চিনতে পারে। চিকিৎসকেরা এ ভাষাতেই এখনও ঔষধের নাম লিখে থাকেন। আধুনিককালের বহু শব্দ ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে। রোমে তৈরি পঞ্জিকা পৃথিবীর অনেক দেশেই ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি বার মাসের নাম ল্যাটিন ভাষা থেকে উদ্ভূত। লুক্রেৎসিউস, ভেগিলিউস এবং অন্যান্য রোমীয় লেখকদের রচনা ইউরোপীয় সাহিত্যকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। রোমানদের লিখার ও গম্বুজ নির্মাণের কৌশল পৃথিবীতে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে অমূল্য অবদান রেখেছে।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা

মিসরের নীল নদের অববাহিকায় পৃথিবীর প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। মিসরীয় সভ্যতার মত আর কোন সভ্যতা মানব জাতির ক্রম বিবর্তন, উন্নতি ও উৎকর্ষতায় এতবড় অবদান রাখতে পারে নেই। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০৯০ পর্যন্ত বিস্তৃত।

মিশরীয় সভ্যতার অবদান : মানব সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয় সভ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর। মিশরীয় সভ্যতার অবদান মানব সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। নিচে মিসরীয় সভ্যতার (ক) রাষ্ট্র ও সমাজ (খ) অর্থনীতি (গ) ধর্ম ও (ঘ) লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

(ক) **রাষ্ট্র ও সমাজ :** খ্রিস্ট্রপূর্ব ৩২০০ সাল থেকে মিসরের নীল নদের অববাহিকায় সংঘবদ্ধ জাতির বসবাস শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সালের পূর্বে মিসরকে প্রাক রাজবংশীয় যুগ বলা হয়। প্রাক্ রাজবংশীয় যুগে মিসরীয় সভ্যতার সুচনা হয়। এ সময়ে মিসরে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নগররাষ্ট্র ছিল-এতে রাষ্ট্রগুলো সংঘবদ্ধ ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ সালে মেনেস নামের এক রাজা সমগ্র মিশরকে একত্রিত করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমে এ রাষ্ট্রের রাজধানী উত্তরে থিরিসে ছিল। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে দক্ষিণ মিসরে মেসফিসে আসে। মিসরের শাসনকর্তাকে ফারাও (Pharaoh) বা ফেরাউন বলা হত। তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য শাসন করতেন। রাজা বড় রাজ প্রাসাদে বাস করতেন এবং প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে তাকে ফারাও বলা হত। ফারাওগণ পরাক্রমাশালী ছিলেন, শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে রাজ্য শাসন করতেন।

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ : প্রাচীন মিসরীয় সমাজ পেশাভিত্তিক কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো :

১। রাজ পরিবার ২। পূরোহিত শ্রেণী ৩। অভিজাত সম্প্রদায় ৪। ব্যবসায়ী শ্রেণী ৫। লিপিকার ৬। শিল্পী এবং ৭। কৃষক ও ভূমিদাস।

রাজপরিবার ও শাসক সম্প্রদায় ছিল সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে এবং শ্রমজীবী কৃষক ও ভূমিদাসের অবস্থান ছিল সমাজের নিম্মস্তরে।

(খ) **অর্থনীতি :** প্রাচীন মিসরীয় অর্থনীতি ছিল কৃষি ভিত্তিক। কৃষক ও ভূমিদাস কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকত। প্রাক রাজকীয় যুগ থেকেই মিসরীয়রা চাষের জন্যে লাঙ্গলের ব্যবহার শুরু করে। কৃষি কাজের জন্যে জল-সেচ, জলাশয়কে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার কৌশল তারা আবিস্কার করে। গম, যব, তুলা, পেয়াজ অন্যতম কৃষিজ পণ্য ছিল।

কৃষিকাজ ছাড়াও প্রাচীন মিসরীয়রা বিভিন্ন ধরণের মাটির পাত্র নির্মাণ করত। তারা বিভিন্ন ধরণের হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারও জানত। পাথর শিল্প, নৌযান তৈরী, মাটির পাত্র রপ্তানি এবং সোনা, রূপা, হাতির দাঁত, কাঠ ইত্যাদি আমদানি করত। ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ফিনিশিয়া ও ক্রীট দ্বীপের সাথে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল।

(গ) **ধর্ম :** প্রাচীন জাতি সমূহের মধ্যে মিসরীয়রা প্রথম ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রচলন করে। প্রাচীন মিসরীয়দের জীবনে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। মিসরীয়দের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনের অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতিফলন দেখা যায়।

মিসরীয়দের প্রধান দেবতার নাম ছিল আমনরে (Ammon-Ro)। নীল নদী ভিত্তিক সভ্যতার অপর এক দেবতার নাম ছিল ওসিরিস-(Oseris) ওসিরিস নীলনদের দেবতা বলেও পরিচিত ছিল। এ দু'দেবতাই প্রভাবশালী ছিল। অন্যান্য দেব-দেবী তেমন প্রভাবশালী ছিল না। মিসরীয়দের পূর্নজীবনের প্রতি এবং দোযখ ও বেহেস্তের প্রতি তাদের পূর্ণবিশ্বাস ছিল।

(ঘ) **লিখন পদ্ধতি :** মিসরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিখন রীতি এবং মিসরীয়রাই সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতি আবিস্কার করে। গ্রীক ভাষায় এ নামের অর্থ হল পবিত্র লিপি। এ লিখন পদ্ধতির চব্বিশটি চিহ্ন ছিল এবং প্রতিটি চিহ্ন একটি বিশেষ অর্থ নির্দেশ করত। প্রতিটি চিহ্ন পাশাপাশি খোদিত করে শব্দ প্রকাশ করা হতো। ধর্ম লেখা এবং রাজার আদেশ প্রচারের জন্যে এ ধরনের লিপিকে ব্যবহার করা হত। ধীরে ধীরে লিখন পদ্ধতির উন্নতি ঘটে। চিত্রভিত্তিক থেকে অক্ষরভিত্তিক এবং শেষে বর্ণভিত্তিক লিপি ব্যবহৃত হয়। পাথর বা কাঠের গায়ে প্রথমে লিপি খোদাই করা হত। মিসরীয়রা প্রথমে নলখাগড়া জাতীয় পাপিরাস গাছের মন্ড থেকে কাগজ তৈরী করে। এ কাগজের নাম ছিল পাপিরাস। লিপিকারগণ পাপিরাসের গায়ে লিখে রাখত। বিশ্বসভ্যতায় মিসরীয়দের অবদান অনবদ্য। শুধু লিখন পদ্ধতি, রাষ্ট্র ও সমাজ, অর্থনীতিতে তাদের অবদান সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং প্রাচীন সভ্যতার সর্ব ক্ষেত্রে অবদান চিরস্মরণীয়।

সারকথা:

মানব ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সে স্তরকেই সভ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয় যখন আবিষ্কৃত হয়েছে লিখন পদ্ধতির; উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে শিল্প ও বিজ্ঞানের, উন্নতি সাধিত হয়েছে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের মাধ্যমেই সভ্য যুগের উদ্ভব ঘটে। সভ্য যুগের দু'টি বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পুরাতন গ্রাম সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলা নগর সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী, মিশরের নীল নদ, ভারতের সিন্ধু নদী, চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর অববাহিকায়। এসকল নদীবিধোত অঞ্চলে নিয়মিত পানি সরবরাহ, উর্বর ভূমি, যানবাহনের সুযোগ, মৎস্য সম্পদ, বনজ সম্পদ ইত্যাদি কারণে সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় কবে থেকে ?

ক. খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ থেকে
খ. খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে
গ. খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ থেকে
ঘ. খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে।

২. মিশরীয় সভ্যতার সময়কাল কত ?

ক. খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২০৯০ পর্যন্ত
খ. খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০৯০ পর্যন্ত
গ. খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২০৯০ পর্যন্ত
ঘ. খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০৯০ পর্যন্ত।

৩. রোমানদের শ্রেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পায় কিসে?

ক. অনুবাদ কর্মে
খ. উদ্ভিদ ও পশু পাখির নামকরণে
গ. ভাস্কার্য তৈরিতে
ঘ. আইন প্রণয়নে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১. সভ্যতা কাকে বলে ?
২. প্রাচীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন সভ্যতার অবদান বেশি ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার একটি বিবরণ দিন।
২. প্রাচীন রোমান সভ্যতার একটি বিবরণ দিন।

উত্তর : ১. ক ২. খ, ৩. খ, ৪. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। Wallbank and Taylor, Civilization : Past and Present.
২। R.C. Majumder, Ancient India.